কবি উত্তম দাশের প্রকৃতিচেতনা: বহুস্তরী রূপ

দেবদাস গায়েন

অনুচিন্তন

ষাট দশকের কবি উত্তম দাশ (১৯৩৯-২০১৪) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত না হলেও অপরিচিত নন।তিনি ছিলেন একাধারে বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর সফল পদচারণা পরিলক্ষিত হয়।তাঁর প্রথম ও প্রাথমিক পরিচয় তিনি কবি।তাঁর কবিতার সংসার একাধিক বিষয়ের সমন্বয়ে বর্ণময় ও রঙিন।তবে তাঁর সকল কাব্যভাবনা পর্যায়ক্রমিকভাবে যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কিন্তু নয়।একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ভাবনার প্রকাশে কবিতাভুবন হয়ে উঠেছে চিত্রিত সংগ্রহশালা।এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা কবি উত্তম দাশের প্রকৃতিচেতনার স্বরূপ তুলে ধরবো।

সূচক শব্দ: প্রকৃতিচেতনা, প্রকৃতিপ্রীতি, চলিষ্ণু প্রকৃতি, সৌন্দর্যের অফুরান আধার, বৈচিত্র্যময় বহুরূপতা, প্রকৃতিবীক্ষণ, প্রকৃতিবোধ, প্রকৃতির অনুষঙ্গ, প্রকৃতির আনন্দসাগর, প্রকৃতিভাবনা, নিসর্গচেতনা।

> ‘প্রকৃতি আমার মধ্যে কখনো নিছক প্রকৃতি থাকে নি, জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে মিশে তার রূপ-রঙ পাল্টে গেছে, কিন্তু আভাসে রয়ে গেছে তার রহস্যময় সংস্থান’[১]

নদ-নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত-গিরিকন্দর, বনকান্তার-অরণ্য, জল-বাতাস, আকাশ ভরা চন্দ্র-সূর্য-তারা, দিন-রাত, মেঘ-রোদ-বৃষ্টি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত— এই নিয়ে আমাদের বিপুলা পৃথিবী। প্রকৃতি তার প্রকাশ মাধ্যম। অনন্ত সৌন্দর্যের অফুরান আধার এই মহাপ্রকৃতি। নিত্য নিত্য নতুন নতুন সৌন্দর্যের ডালি হাতে সে মানুষকে হাতছানি দেয়। সৌন্দর্যের চিরপূজারী মানুষ অনন্তকাল ধরে ছুটে চলেছে নিসর্গ প্রকৃতির আহ্বানে। বহমান সময়ের সঙ্গে প্রকৃতি ও চলমান। চলিষ্ণু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভরিয়ে তোলে নব নব সৃষ্টির আধারকে।

পৃথিবীর সকল দেশের, সকল কালের স্রষ্টার কলমে প্রকৃতি ও তার বৈচিত্র্যময় বহুরূপতা ঘুরে ফিরে এসেছে বারে বারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য- দুই দেশের সাহিত্য সম্পর্কে একথা সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রকৃতি ও সৌন্দর্যতত্ত্ব মিলেমিশে সে দেশের সাহিত্য অঙ্গনকে মুখরিত করে তুলেছিল। সাহিত্যে বর্ণিত প্রকৃতি হয়ে ওঠে স্রষ্টার রূপমুগ্ধ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এদেশের সাহিত্যে প্রকৃতির অবতারণা, নিসর্গের উপস্থাপনা সেই সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ থেকে। পরবর্তী কালে প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়ে একালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জীবনানন্দ দাশ-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সাহিত্যে তার পরিপূর্ণতা। এঁদের লেখনীতে প্রকৃতি সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি নর-নারীর প্রেম-বিরহের গাথা রচনার মাধ্যম হয়েছে। প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে বাঙালি লেখকরা ধরে দিলেন তাঁদের গল্প, কবিতা ও উপন্যাসে। তাঁদের সৃষ্টির বিচিত্রভুবনে বাংলার সবুজ-শ্যামল নিসর্গ প্রকৃতি জীবন্ত-সত্তা হয়ে বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান ও চলমান।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে আবির্ভূত হলেন হেগেল প্রমুখ একদল ভাববাদী দার্শনিকগণ। এরা সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে নিসর্গ চেতনায় অনাস্থা প্রকাশ করলেন।এই ভাববাদী দর্শন ক্রমে সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।কাব্যে আধুনিকতার প্রবক্তা বোদলেয়ার, রিলকে প্রমুখ কবিরা প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলেন।এদের বক্তব্য প্রকৃতি মানুষের সৃষ্টি নয়।তাই যা মানুষের সৃষ্টি নয়, তা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্ব-শাসিত)

কখনো একালের সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যেও এই প্রকৃতি বিরোধিতার ছোঁয়া লাগল।প্রকৃতিকে অস্বীকার করার ঝোঁক বাড়ল একদল তরুণ কবিদের মধ্যে।বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করে তিরিশের দশকে যে সব আধুনিক কবিরা সাহিত্যচর্চায় এলেন তারা সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বললেন -

'বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা'[২]

শুধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নয়, কল্লোলীয় ও উত্তর কল্লোলীয় কবিদের কাছে নিসর্গ প্রকৃতির চেয়ে সমকালীন সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবনমন, হিংসা, ক্রুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সংশয়, ক্লান্তি, অবসাদ, নগর সভ্যতার যন্ত্রণা, বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক সঙ্কট ইত্যাদি মানুষের জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলি কাব্যে প্রাধান্য পেতে থাকে। এই ভাবে প্রকৃতি বিরোধিতা এই সময়ের একদল কবিদের স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু পরবর্তী কালে প্রকৃতি সম্পর্কে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন কবিকুল আবার দু'বাহু বাড়িয়ে ফিরে যেতে চাইলেন প্রকৃতির কোলে। তবে চলে আসা গতানুগতিক প্রকৃতিচেতনার বাইরে নতুন পথের সন্ধান করলেন একদল নবাগত কবি। এদের কবিতায় প্রকৃতি আর কেবলমাত্র চোখের কাছে বাধা থাকলো না, মস্তিষ্ক ও অনুভবের জায়গায় নতুন করে নানা সুরে ঢেউ তুলল।একমাত্রিক প্রকৃতি এদের কলমে হয়ে উঠল বহুমাত্রিক। কবি উত্তম দাশের কবিতায় এই পরিবর্তিত প্রকৃতিবীক্ষণের বহুস্তরী ও বহুস্বরী রূপ প্রতিবিম্বিত হল। তিনি প্রকৃতিচেতনার রন্ধে রন্ধে তার লেখনী চালনা করলেন। প্রকৃতির প্রান্তরে প্রান্তরে পা ফেলে তার বিচিত্র রূপের মধ্যে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে তাকেই শব্দ-ছন্দে-চিত্রে বাণীরূপ দিলেন প্রকৃতি-আশ্রিত কবিতাগুলিতে। ফলে, তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনো ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কখনো বা মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমি কিংবা মানব মনের নানা অবস্থার প্রতিরূপ হয়ে ধরা পড়েছে।

কবি উত্তমের জন্ম ও বড়ো হওয়া গ্রাম-বাংলার নিসর্গ পল্লী-প্রকৃতির বুকে। প্রথম দিকে ওপার বাংলার নোয়াখালি ও পরবর্তী কালে এপার বাংলার সাগরদ্বীপে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে।ফলে অশৈশব প্রকৃতির সঙ্গে কবির আত্মার আত্মীয়তা। যাকে বলে একেবারে নাড়ীর যোগ। প্রকৃতি তাঁর রক্তধারায় নিসর্গ চেতনার যে স্রোত বইয়ে দিয়েছে তাকেই তিনি কবিতায় ধরে দিয়েছেন নিজস্ব ভাবনার রসে, কল্পনার রঙে। প্রকৃতি তাঁর আশ্রয়।প্রকৃতি তাঁর ভালোবাসা।প্রকৃতি তাঁর শৈশবের লীলাক্ষেত্র। প্রকৃতির কোলে তিনি লালিত ও পালিত। প্রকৃতিপ্রীতি তাঁর সহজাত। প্রকৃতি তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে নানা বর্ণে, নানা রঙে। প্রকৃতিকে তিনি নিবিড় ভাবে আত্মিক অন্তরঙ্গতায় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। গ্রাম-বাংলার নিসর্গ প্রকৃতিতে তিনি কান পেতে যা শুনলেন, চোখের আলোয় যা দেখলেন ও হৃদয়দুয়ার খুলে যা অনুভব করলেন তাকেই তিনি কবিতায় ধরে দিলেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাই তো কবি তাঁর 'আমার মধ্যে একজন' কবিতায় বলে উঠলেন—

'পিকাসোর প্যাঁচার মতো জীবন
সামনের শ্যাওলা পুকুরে এইমাত্র ডুব দিয়ে চাঁদ ধরে এলো
বারান্দায় ঝুঁকে পড়া নিমের ডালে হঠাৎ বৃষ্টির ঝাঁপ
জ্যোৎস্না খসিয়ে লোড-শেডিং-এ
আমার মধ্যে একজন একলা
মোমের আলোয় কবিতা লেখে'[৩]

এই বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, সমস্ত কিছুর অন্তর-রহস্য কবি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তার এই প্রকৃতি পরিচিতি ও প্রকৃতি দর্শন গঠন করেছে বিশেষ কবি মানস, নির্মাণ করেছে নিজস্ব কাব্যবিশ্ব। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ফেলা আসা শৈশবকে প্রতিষ্ঠিত করে কবি বলেছেন—

'আমার শৈশব যেন সিংহলের বাণিজ্যতরী
মৃদুগন্ধী দারুচিনি লবঙ্গের স্বগত সৌরভ
সম্মোহিত চেতনায় অনুলিপ্ত প্রসন্ন ধরনী
প্রথম পুলক স্পর্শে মুকুরিত মর্ত্য অনুভব।'[৪]

শৈশব সিংহলের বাণিজ্যতরী বাইতে বাইতে কবি স্মৃতির সরণি ধরে হাজির হলেন জন্মভূমি চরসেকেন্দার গ্রামে। শিশুর মতো নিষ্পলক চোখে অবলোকন করতে থাকেন আবাল্য পরিচিত গ্রামকে। ছবির মতো সে পল্লী প্রকৃতি। কবির চোখে চেনা গ্রাম নতুন রূপে ধরা দেয়। রূপদক্ষ শিল্পীর মতো রঙ তুলি নিয়ে তিনি ছবি আঁকতে বসে যান। নিপুণ চিত্রকরের চিত্রশিল্প হয়ে ওঠে কবিতার পর কবিতা। যেমন—

'ডোবা পুকুর পাড় ধরে গ্রামের রাস্তা
সোজা উঠে এসেছে বাড়ির মধ্যে।
মাটির দেওয়াল এখন খসে পড়ার ভঙ্গিতে
দু পাশে ঘরগুলো পড়ে গিয়ে উঠোন অনেক বড়ো'[৫]

এই ডোবা, পুকুর, গ্রাম্য মেঠোরাস্তা, মাটির ঘরবাড়ি এক সময় কবির খুব পরিচিত ছিল, ছিল একান্ত আশ্রয়। তাই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও বাল্যের নোয়াখালির সবুজ শ্যামল প্রকৃতি কবির মনের মণিকোঠায় আজও সজীব, সতেজ ও অমলিন। এই নোয়াখালির স্মৃতিচিত্রের পরিচয় পাই বুদ্ধদেব বসুর 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের 'নোয়াখালি' প্রবন্ধে। আসলে প্রকৃতিকে নিবিড় করে ভালো না বাসলে, আপন করে না নিলে প্রকৃতির এমন সজীব বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয—

'এখন সজীব স্মৃতি আম জাম-হিজলের ডালে
দুরন্ত দুপুর দোলে বাগানের শীতল ছায়ায়

শাপলার নরম ডাঁটা আজো যেন লেগে আছে গালে

গৃহস্থ ঘরের টঙে কবুতর আজো গান গায়।[৬]

কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির এই নিবিড় উপস্থিতি আমাদের অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে উত্তমের দেখার চোখটাই আলাদা। সে দেখার মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকি কোনটাই নেই। চেনা গ্রাম্য প্রকৃতিকে তিনি শুধু নতুন করে দেখলেন না, পাঠককেও দেখালেন। জীবনানন্দ উত্তরকালে যে সকল কবিদের কবিতায় সবুজ বাংলার বর্ণময় তাপ ও ভাপ বর্তমান কবি উত্তম দাশ তাদেরই অন্যতম। তাই উত্তমের এই প্রকৃতি চেতনা জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার প্রকৃতি চেতনার যে বিবর্তিত রূপ তা বললে অত্যুক্তি বলা হবে না। তবে বৈচিত্র্যে ও মৌলিকতায় কবির প্রকৃতিবোধ যে স্বতন্ত্র ঘরানার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবি উত্তমের প্রকৃতিপ্রীতি একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। সেই বহুমাত্রিকতায় বিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রকৃতির অনুষঙ্গ কবিকে কখনো কখনো নস্টালজিক করে তোলে। পুরানো সে দিনের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। শৈশবের সেই সব স্মৃতি যা তাঁর রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে। তাকে তিনি আজীবন অন্তরের অন্তরস্থলে সযত্নে গচ্ছিত রেখেছেন। এ যেন কবির কাছে সাত রাজার ধন এক মাণিক। প্রকৃতির দর্পণে হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে রোমন্থন করে তিনি জানিয়েছেন—

'আমার ছিল আকাশভরা

নীল পাখিদের ডানা

আমার ছিল নদীর স্রোতে

ছায়ার আঁকি বুকি

সাগর থেকে আনা,

আমার ছিল মুগ্ধ দুপুর

ঘুড়ির খোলা ছাদ।'[৭]

এ নিছক প্রকৃতির বর্ণনা নয়, প্রকৃতির হাত ধরে অতীতে ফিরে যাওয়া, ফেলা আসা শৈশবকে ফিরে পাওয়া। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা। কবি মানস-কল্পনায় ফিরে গেলেন বাল্যের দিনগুলিতে। বহু দিনের পরিচিত বন্ধুর মতো প্রকৃতির মুখোমুখি বসলেন। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন নিবিড় নৈকট্য,

'কতদিন পরে এই ফিরে আসা ডালপালা ভেঙে যেন

কৈশর নেমেছে এই জঙ্গলের তীর ঘেঁসে নদীর ভাঁটিতে'[৮]

কবি উত্তম দাশ রূপদর্শী। আবার তিনি সৌন্দর্যের পূজারী। বাংলার বর্ষা-প্রকৃতি নবনব সৌন্দর্যের আধার হয়ে কবি কলমে ধরা পড়ছে। কবি মুগ্ধচিত্তে মেঘ-বৃষ্টির গান গেয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার একটা বড়ো অংশ জুড়ে বৃষ্টি ও তার অনুষঙ্গ বিরাজমান। মেঘ-বৃষ্টি ও রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা নানা রূপ-রঙে জারিত হয়ে চিত্রিত হয়েছে কবির কলমে। বৃষ্টিভেজা গ্রাম্য-প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ রূপসন্ধানী কবির লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে একাধিক

কবিতায়। যেমন—

'বৃষ্টিপড়ে
গ্রামে গ্রামান্তরে
ঢেউ-ভাঙা সবুজ প্রান্তরে
কোন মন্ত্র জপে নিরন্তর।
এপারেও বৃষ্টিপড়ে প্রাণের গভীরে
মাতাল শরীরে
অলৌকিক অভিসার'[৯]

এশুধু নিছক বৃষ্টির বর্ণনা নয়। তার বাইরে বৃষ্টির একটা আলাদা তাৎপর্য আছে এ-কবিতায়। বৃষ্টি কেবল গ্রাম-গ্রামান্তরে সবুজ প্রান্তরে ঝরছে না, কবির মনেও ঝরছে।যা চোখে দেখা যায় না, একান্ত অনুভবের। এই অনুষঙ্গে আমাদের অগ্রজ কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' কাব্যের 'বৃষ্টি' কবিতার কথা আমাদের স্মরণে আসে। বৃষ্টি মাটির ঘুম ভাঙায়। তার তৃষিত প্রাণে তুলে ধরে তৃষ্ণার জল। তার সাথে সাথে কবি-চৈতন্যেও বৃষ্টি ঝরে। বাইরের প্রকৃতির মতো কবিও ভিজছেন সেই সুধাধারায়। যেন সাধিকা রাধিকার মতো কোন এক অলৌকিক অভিসারের জন্য কবির মানস-প্রস্তুতি। বৃষ্টি কবিমনকে গতি দান করেছে। যে বৃষ্টি ছিল শুধুমাত্র দৃশ্যগ্রাহ্য তা কলমের এক মোচড়ে পথবদলে হয়ে ওঠে অনুভবগ্রাহ্য। যা ছিল লৌকিক, তা হয়ে উঠলো অলৌকিক। যা ছিল ধরা তা হয়ে উঠল অধরা। সসীম থেকে অসীমের দিকে তার যাত্রা। আর এখানেই কবির প্রকৃতি চেতনার স্বতন্ত্রতা।

কবির প্রকৃতিচেতনায় এই স্বতন্ত্রতার ছাপ সুস্পষ্ট। বৃষ্টি মুখর অন্ধকার রাত্রির একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। তা এক রহস্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। সে কখনো মানুষকে কাঁদায়, কখনো ভাবায় আবার কখনো বা চেতনার অন্য জগতে নিয়ে যায়। কবি উত্তম দাশের বহু কবিতায় নিশীথ রাতের বাদল-ধারার জলছবি দেখতে পাই। তা অন্ধকারে অন্তর্লীন হয়ে কবি-চেতনায় সুরের স্পন্দন তুলেছে। তাই তো কবির কথায় শুনতে পাই—

'সারারাত ঝড়জলে ঝড়ো-কাক
আকাশের নীচে আছি সারারাত
ঝড়-জলে
সারারাত
টুপ
টাপ
জলে
ঝড়ে

সারা

রাত

টুপ

টাপ' [১০]

সঘন গহন শ্রাবণরাত্রির এক নিখুঁত কোলাজ কবিতাটি। এযেন অনন্তকালের বৃষ্টি। এর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শুধু ঝরছে তো ঝরছে, ঝরেই চলছে। পাঠকের কবিতাপাঠ শেষ হলেও মনের মধ্যে বৃষ্টির রেশ চলতে থাকে। 'টুপ' 'টাপ' করে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ আমাদের মুখরিত করে তোলে।অন্তর্দশী কবির যে বিশ্বাস ও মনোভাবনা এখানে শব্দ ছন্দে কবিতায় রূপ পেয়েছে তা আমাদের চেতনাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়।

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বৃষ্টি আরো মোহময়ী ও রহস্যময়ী হয়ে ধরা দেয় কবির কাছে। বৃষ্টির মোহিনীরূপে কবি মুগ্ধ। নতুন নতুন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে কবিকে সে ডাক দেয়। এই আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বৃষ্টিবিলাসী কবির পক্ষে। তিনি ঘরে থাকতে পারেন না। বেরিয়ে পড়েন কখনো বক্সার অরণ্যে, আবার কখনো বা ডুয়ার্সের চা বাগানে। বর্ষারাতের বৃষ্টিমাখা অরণ্যের প্রাণস্পন্দন কবি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে জানিয়েছেন—

'চোখের সামনে ফরেষ্ট বাংলোর রাত ভিজছে

অন্ধকার ভিজছে, অনুমান করা যায়

গাছপালাও ভিজছে, আধখানা ভিজেই

ভেতরে বৃষ্টির শব্দ টের পাচ্ছি

শুধু টুপটাপ ঝরে যাচ্ছে।'[১১]

নির্জন জঙ্গলে রাতের অবিরাম বর্ষণের সঙ্গে একাকী কবি খুব সহজেই একাত্ম হয়ে যান। হয়তো বা কোন এক অলৌকিক বাদলের স্বাদ পেতে তাঁর এই বিনিদ্র রজনী যাপন। এই বৃষ্টি কবিকে অন্তর্মুখী করেছে। সাবাই যখন ঘুমিয়ে তিনি তখন অপেক্ষায়। তার মনে হয়েছে বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দের মধ্যে কে যেন তাকে ডাকছে। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ যেমন শুধু বন মাঝে বাজে না, রাধার মন মাঝেও বাজে ঠিক তেমনি গভীররাতের এই বৃষ্টি বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন কবির মনেও সুর তোলে। সেই সুর কবিকে চঞ্চল করে তোলে। ক্ষণকালের বৃষ্টি হয়ে ওঠে চিরকালের।

অরণ্য-সুন্দরী ডুয়ার্স কবি উত্তমের মর্ত্যের নন্দনকানন। তার প্রাকৃতিক রূপ ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে কবি বারে বারে ছুটে গেছেন সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর আদিমতার মাঝে। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের বৃষ্টি একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে কবির প্রকৃতি-চেতনায়। কারণ তাঁর বিশ্বাস—

'ডুয়ার্সের একটা স্নেহগুন আছে,

খুব বৃষ্টিতে ভেজে তো, তাই।'[১২]

শুধু কি তাই, এই —

'ডুয়ার্সের বৃষ্টিতে সারারাত জেগে থাকে চায়ের বাগান'[১৩]

কিন্তু শুধু চা-বাগান নয়, সেই সঙ্গে জেগে থাকে সৌন্দর্যপিপাসু কবিও। এই বৃষ্টি কবিকে অতীতবিলাসী করে তোলে। বৃষ্টির অনুষঙ্গে তিনি ফেলে আসা দিনগুলিকে স্থাপন করলেন সময়ের ক্যানভাসে। বৃষ্টির অদ্ভুত যাদু স্পর্শে স্মৃতির সরণি বেয়ে কবি হাজির হলেন শৈশবের আঙিনায়।

'ডুয়ার্সের চা বাগানে বৃষ্টি নামলে
আমি যেন মাথা দুলিয়ে ধারাপাত পড়ছি
জলপানের এমন উৎসব ভরা বর্ষায় চা বাহানে না এলে
তুমি কখনো বুঝতে, আমি ও কি শৈশবের তীরে বসে
এমন করে ধারাপাত পড়তে পারতুম'[১৪]

চা বাগানের এই অলৌকিক বৃষ্টি কবিকে স্মৃতিমেদুর করে তুলেছে। কবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও প্রকৃতির ধারাপাতের তালে তালে মাথা না দুলিয়ে পারি না। বাংলাদেশের বৃষ্টির সঙ্গে কবির এক নিবিড় আত্মীয়তা। তাই বিদেশযাত্রারত এদেশের বৃষ্টির স্বাদ ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত কবির আক্ষেপ—

'ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ জুড়ে, বৈশাখ তো
সবে শেষ হলো, বঙ্গদেশের বর্ষা এবার
খুব মিস করবো'।[১৫]

বৃষ্টির মতো নদী ও সমুদ্র কবির খুব প্রিয়। এই বারি প্রবাহে অবগাহন করে তিনি সংগ্রহ করেছেন কাব্যের হরেক রকম মণি-মুক্তা। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—

'নদী বা সমুদ্রের কথা বললে আমি টের পাই এক প্রবাহ'[১৬]

সমুদ্রের নীল জলরাশি কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। তার জলতরঙ্গের চপল-রূপে কবি মুগ্ধ। দুরন্ত ঢেউ এর তালে তাল মিলিয়ে কবি মন নেচে ওঠে। বিরামহীন সমুদ্র গর্জনের মধ্যে তিনি শুনতে পান অনন্ত প্রবাহের মূকভাষা। আদিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন নীল সমুদ্রে জল ধারায় সিনান করে কবি শব্দবন্ধে ধরেছেন অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে,

'দুহাতে ঝিনুক নুড়ি, ঝাউবন, সমুদ্রের ফেনা
অথবা প্রসন্ন রোদে বালির পাহাড়,
বিকেলে লম্বিত ছায়া, বেলাভূমি
আদিগন্ত দৃশ্যের নীলিমা।

দীঘার সমুদ্রবন বালির পাহাড়ে
শুয়ে সূর্যদেব স্নেহের মতন

শুভ্র অনুভব মেলে দেন, নম্র আলিঙ্গনে।[১৭]

সমুদ্র ও নিসর্গ প্রকৃতির এক নিখুঁত শব্দচিত্র। আমরাও কবির সঙ্গে এই সামুদ্রিক সৌন্দর্য-জগতে ভ্রমণ করতে করতে ঢেউয়ের মতো তরঙ্গায়িত হই। মনে হয় কোন এক রূপদক্ষ চিত্রকর রং-তুলি নিয়ে দীঘার সমুদ্রতীরে বসে প্রকৃতির ক্যানভাসে আপনমনে ছবি আঁকছেন এ-কবিতায়।

'ভ্রমণের দাগ' কাব্যের 'জল' কবিতাটি কবি উত্তমের সমুদ্র দর্শনের আর এক অভিজ্ঞান। কবি জানিয়েছেন—

'নদী ও সমুদ্রের কথা বললে
ভেতর থেকে এক প্রবাহ জেগে ওঠে
সমস্ত শরীর ঘিরে জলের কল্লোল বাজতে থাকে'[১৮]

তিনি শব্দ-রূপময় সমুদ্রের অনুভূতি নিজের মধ্যে খুঁজে পান। আর সেই কারণে নীল সমুদ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে বারে বারে ছুটে গেছেন। সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন—

'আমি তো নুনের পাহাড় দেখতে চেয়েছি
জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া নয়
পুরীতে আমার চোখ শুধু সমুদ্র দেখে
সমুদ্রে নামলে আমার শরীর শুধু নুন খায়।'[১৯]

দু'চোখ ভরে কবি আস্বাদন করেছেন সমুদ্রের রূপ। তবে এই নুনের পাহাড় কেবল দর্শনইন্দ্রিয় সংবেদ্য নয়। রূপপিপাসু কবির অন্তরাত্মার সঙ্গে তার গড়ে উঠেছে নিবিড় অন্তরের একাত্মতা। তাই সমুদ্র থেকে ফিরে এলেও সমুদ্র যেন কবিকে ছেড়ে যায় না। বহুদিন পর্যন্ত তিনি নিজের মধ্যে পুরীর সমুদ্রের অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন। চিরসমুদ্র পিপাসু কবি বলেছেন—

'সমুদ্র থেকে ফিরে এলে
অনেক দিন গায়ে কিরকিরে বালির দাগ লেগে থাকে'[২০]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরীর এই সমুদ্র দর্শনে রচনা করেছিলেন 'সোনারতরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি। এই কবিতায় সমুদ্রকে আদিজননী বলে সম্বোধন করে কবি জানিয়েছেন—

'তুমি সিন্ধু প্রকান্ড হাসিয়া
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেশে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।'[২১]

কবিগুরুর মতো কবি উত্তম দাশও মাতৃ-স্নেহরূপ সমুদ্রের স্নেহমাধুর্যে পরিতৃপ্ত ও সফলকাম। সমুদ্রের সেই স্নেহতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তিনি দীপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

'জল এমন করে জড়িয়ে ধরে
নিজস্ব গোপন আর থাকে না,
সারা অবয়ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে
পরিচিতের মতো স্নেহ কাতর হয়ে
স্পর্শ থেকেই সুরের জন্ম দেয়।'[২২]

কিংবা;

'জগতের মাঝে একাকী মানব প্রকৃতই
মনে হয়, হে সমুদ্র সামনে দাঁড়ালে
যতদূর তোমার বিস্তার, ততদূর এই আমি
ততদূর ভালোবাসা, গহন গম্ভীর সেই ভালোবাসা [২৩]

কবির এই দেখার ভঙ্গী মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের শাশ্বতকালের যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেছে। সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের যে মানসপ্রয়াস আমারা রবীন্দ্রনাথে দেখি তারই বিবর্ধিত রূপ যেন কবির এই কবিতাটি।

মানুষ ক্রমশ প্রকৃতির কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। প্রকৃতির অকৃত্রিম স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। প্রকৃতিবিচ্যুত সেই মানুষকে নতুন করে প্রকৃতির কাছে ফিরিয়ে আনার এক অভিনব প্রচেষ্টা শিল্পিত হয়েছে 'এ জন্মের প্রত্যাহার চাই' কাব্যের 'রসুলপুরে' কবিতায়। প্রকৃতির ক্যানভাসে একাধারে সমুদ্র ও সাহিত্যের কোলাজ চিত্রিত করলেন কবি,

'রসুলপুরের এই বাঁকে নবকুমার পথ হারিয়েছিল
ঝাউয়ের বনে শীতের রোদ হলুদ-পাতার মতো ঝরছে
সেই রোদের উত্তাপ কুড়োতে কুড়োতে আমরা মোহনার দিকে যাচ্ছি
বনের শেষ সামনে খোলা বেলাভূমি
কাপালিকের মতো হাতছানি দিয়ে ডাকছে'[২৪]

যান্ত্রিকতায় বিপন্ন চেনা ঘেরাটোপে আবদ্ধ মানুষের কাছে এ জাতীয় কবিতা বেঁচে থাকার এক ঝলক মুক্ত বাতাস বয়ে আনে।কবিতায় বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়।নগর-সভ্যতায় ওষ্ঠাগত ক্লান্ত মানুষ মুক্তির আকাশ খুঁজে পায়।প্রকৃতিনিষ্ঠ কবি আমার আমিতে আবদ্ধ গৃহবন্দী মানুষকে কবিতায় হাত ধরে নিয়ে চলেন মুক্ত নদী-প্রকৃতির রূপকথার রাজ্যে।যেখানে-

'শুধু একটা নদী, তার কোন লোকালয় নেই,
অরণ্য ছায়া ফেলে ফেলে ফেলে বন্ধুর মতো জড়ায়
সার্ডিন মাছের ঝাঁক স্রোত ভেদ করে ছোটে,
দু একজন বন্ধু-পাথর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে

এসো একটু গল্প করি, কত গল্প,

কত হল্প, গল্প আর ফুরায় না,

শুধু ঝমঝম আর ঝমঝম।'[২৫]

আমাদের জীবনও বহমান এই নদীর মতো। জীবন-জীবিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে আমরা আজ বড়ো ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ ও একাকী। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ক্ষণিক বিশ্রামের, প্রয়োজন হয়ে পড়ছে দু-একজন ভালো বন্ধুর। কিন্তু অস্থির সময়ে এ-দুই পরশ পাথরের মতো দুর্লভ। তাই কবি প্রকৃতির কাছে ফিরে এসেছেন। একমাত্র প্রকৃতি সেই বন্ধু যে শুধু দিতে জানে, কিন্তু নিতে জানে না। প্রকৃতি পরম বন্ধুর মতো আমাদের একাকিত্বকে দূর করতে পারে।

সকাল-দুপুর-রাত্রি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা , প্রকৃতির আপন নিয়মে ঘটে। প্রকৃতির এই সব অযাচিত দান প্রকৃতিপ্রেমিক উত্তম দু'হাত বাড়িয়ে অকুণ্ঠচিত্তে আকণ্ঠ গ্রহণ করেছেন। দস্যুর মতো লুঠ করে নিয়েছেন তার সৌন্দর্য। তাই তাঁর কাব্যে শোনা যায় নিসর্গ প্রকৃতির কলতান। কবিতার পর কবিতায় বাজতে থাকে দিবা-রাত্রির ঐকতান। তার প্রকৃতি-অন্বিষ্ট কবিতাগুলিতে নিসর্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মদিরা ফেনায়িত হয়ে উঠেছে কানায় কানায়। যেমন—

'এখন ভোর হল

উড়ন্ত সূর্য ঢেউ-এর মাথায় নাচতে নাচতে

দৃশ্য ভেদকরে পুরীর বেলাভূমিতে রঙের জাফরানি এঁকে গেল।[২৬]

উত্তমের কবিতায় উল্লিখিত ভোরের এই সমুদ্রপ্রকৃতি আমাদের 'ছিন্নপত্র'-এর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ৫৩ সংখ্যক পত্রে কবি লিখেছেন—

'রঙিন সকাল ও রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগবধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক

একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে পড়ে যাচ্ছে।আমাদের মনের মধ্যে

একটা এসে পড়ে না।'[২৭]

কবিগুরুর এই মন্তব্যের রেশ ধরে আমারা আমরা বলতে পারি উত্তমের এ জাতীয় কবিতাগুলি সত্যি সত্যি প্রকৃতির ছিন্নহারের এক একটি মুক্তকণা। যা একটার পর একটা টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে ষাটের কাব্যসমুদ্রে। যেমন—

'খুব কষ্ট করে পাহাড় ভেঙে সূর্যদেব উঠে এলেন

একটু আগে ডিসেম্বরের আকাশ কুলকুচি করে

সাত-সকালে পাথরকুচির রাস্তা ভিজিয়ে গেছে

তিনি খুব কষ্টকরে পাহাড় ভেঙে উঠে আসতেই

পাইন গাছের গা থেকে লম্বা ছায়ারা

সাঁতারুর পোষাক পরে লাফিয়ে পড়েছে লেকে

এই দৃশ্য দেখবে বলে প্রহরী পাইনের সঙ্গে

দলবদ্ধ মেঘের একটা সংঘর্স বেঁধে গেল'[২৮]

দ্বিপ্রহরের নির্জনতাও উত্তম-কবিতায় সমহিমায় উপস্থিত।নিস্তব্ধ দুপুরের এক আলাদা সৌন্দর্য্ও মাধুর্য আছে।দুপুর যে কত সুন্দরী হতে পারে; তার রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের রহস্যময় অনুভূতি পাই তাঁর একাধিক কবিতায়।এই কবিতাগুলিতে কবি বিমুগ্ধ চিত্তে 'নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালার' অনন্ত সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছেন।

'নগ্নতার মত এক নির্জনতা ঘিরে থাকে

রাত্রি নয় দুপুরের অবকাশ

ঘিরে থাক নির্জনতা-সমুদ্রের কুমারী নিটোল ঘিরে থাক

আমি এই দুরন্ত ক্যানভাসে পুরুষ ম্যাডোনা

হয়ে শরীরের সবটুকু শ্রম

কিছু লবণাক্ত অশ্রু কিছু বৈরাগী প্রণয়

কিছু কি যেন পেতে চাই এই বোধে

ঘিরে থাক নগ্নতার মত এই নির্জনতা।[২৯]

এযেন সমুদ্র-প্রকৃতির দুপুরের নির্জন তপবনে বসে কোন এক কবি-তাপসের প্রকৃতিপাঠ। কবিতায় বর্ণিত এই দ্বিপ্রহরিক নৈসর্গিক সামুদ্রিক সৌন্দর্য-জগৎ সন্দেহাতীতভাবে বাংলা কবিতায় প্রকৃতির নতুন স্বাদের সংবাদ নিয়ে এসেছে। একদিকে মহাপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও নির্জনতা যেমন কবির প্রকৃতিচেতনার সম্পূর্ণতা দান করেছে তেমনি অপর দিকে কবি দুরন্ত কুমারী সমুদ্রের বুকে পরুষ ম্যাডোনা হয়ে চেতনার অন্য এক জগতের সন্ধান দিয়েছেন। এদিক দিয়ে পুরুষ আর প্রকৃতির আশ্চার্য মিলনগাথা কবিতাটি। দুপুরের পাশাপাশি সামুদ্রিক বিকেলও কবির কলমে রহস্যময়ী নারী হয়ে উঠেছে। গ্রাম্যনারীরূপী অপরাহ্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে কবি জানান—

'বাছুরের দুধ ছাড়িয়ে নেওয়া মধ্যরাত্রির রমণীর মত

কক্সবাজারে সমুদ্রের বিকেল বহুদূরে শুয়ে আছে

লজের বারান্দা জুড়ে ঝাউবনে বেলা যায়'[৩০]

দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার দুই কবি উত্তমের প্রকৃতিবীক্ষায় সমান্তরালে চলমান। দিনের নিসর্গ প্রকৃতির রূপ-রঙ;তাল-মাত্রা আর রাতের মহাপ্রকৃতির মেজাজ ও রূপ এক নয়। রাতের একটা একান্ত নিজস্ব রূপ, মাধুর্য ও সৌন্দর্য্আছে। কবির কলমে রাত্রি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বহুমাত্রিক রূপে ধরা দিয়েছে। কখন সে রহস্যময়ী, কখনো বা সে মোহময়ী। আবার কখনো অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। এমন কি মাঝে মাঝে ভীষণা ভয়ঙ্করীও বটে। এককথায় বহুরূপিণী। মাঝরাতে কবিতার জন্য ওত পেতে বসে থাকা কবি জানিয়েছেন—

'গেয়োখালির ডাকবাংলোয় রাত নেমেছ

প্রকৃতি ফুটে আছে চাঁদের মরা আলোয়, গাছগাছালির ছায়ায়

জোনাকি জ্বলছে নৌকোয়, নিঃশব্দের ঘেরা জাল,

নদীর ছপাত পাড়ে লাগছে, বাতাস ফিরিয়ে দিচ্ছে শব্দ'[৩১]

মধ্যরাতের নিশীথ সমুদ্র-প্রকৃতির অপার রহস্যময়তা কবিতায় অন্য মাত্রা এনেছে। শুধু সমুদ্র নয়, ঘনঘোর জঙ্গলের রাত্রিও বহু কবিতায় অসাধারণ ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে কবির লেখনীতে। যেমন—

'খানিকটা জ্যোৎস্না হলে

জমতো, ঝাড়গ্রামের রাত

পাতার টুপটাপ,

খানিকটা অন্ধকার,

সবে তো মধ্যরাত'[৩২]

মাঝরাতের আলো-অন্ধকারের গীতিকাব্য একবিতা। এর পাশাপাশি 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' কাব্যের 'দার্জিলিং-ডিসেম্বর ১৯৭৯' কবিতায় বরফমোড়া জ্যোৎস্না-স্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘার ইন্দ্রিয়সঘন যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা এককথায় অসাধারণ।

'চাঁদের আলোয় নারীর চেয়ে রহস্যময় নিসর্গ

কাঞ্চনজঙ্ঘার স্তনের সাদায়

জর্ডনের ভেনাস নিদ্রা যাচ্ছেন'[৩৩]

সাধারণ মানুষ ক্রমশ প্রকৃতিবিহীন হয়ে পড়ছে। নিজে নিজের মধ্যে আবদ্ধ। নিসর্গ মহাপ্রকৃতির সঙ্গে সে নিজেকে আর মেলাতে পারছে না। প্রকৃতির তালে তালি দিয়ে, প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে নিসর্গের বন্দনাগীতি গাইতে পারছে না। কি এক অদৃশ্য বাধা, কি এক অদৃশ্য কুহুকিনী তাকে সর্বদা প্রকৃতির অনুকূলে চালিত করছে। প্রকৃতিকে আর নিজের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করতে পারছে না। আবেগহীন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত।কবিও এই অসুস্থ সময়ের সঙ্গী ও সাক্ষী। এই অসহায় অবস্থায় কবি নিশীথ-প্রকৃতির মুখোমুখি বসে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন 'ভারতবর্ষের একজন' কাব্যের 'অন্ধকার বাংলোঘরে' কবিতায়।

'এখন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী

বয়সটা ভালো, খুব জমাটি আর কি

বিশ্বচরাচর এমন গাঢ় না হলে

দেখার সুখ হয় না।

অনেক দিনের জটপাকানো স্নায়ু

আস্তে আস্তে খুলছে

মাঝে মাঝে অস্পষ্ট মনে হচ্ছে

আমাকে যেন আমি চিনতে পারছি'[৩৪]

প্রকৃতির দর্পণে আত্মদর্শনের অভিজ্ঞান একবিতা। সামাজিক অস্থিরতা, মূল্যবোধের অপমৃত্যু, পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, ব্যবসায়ী মানসিকতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার লুব্ধ ইশারায় আমাদের আর আগের মতো প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। প্রতিদিন একটু একটু করে আমরা প্রকৃতি বিচ্ছন্ন হতাশার অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই বিচ্যুতিতে আমাদের আত্মিকমৃত্যু হচ্ছে প্রতি পলে অনুপলে। তাই বলা যায় কবি উত্তমের একবিতা হতাশার অমাঅন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিপন্ন মানুষের আলোর জগতে প্রত্যাবর্তনের দীপবর্তিকাস্বরূপ।

প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে প্রেমের উপস্থাপনা একালের কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রেম ও প্রকৃতি কখনো পৃথকভাবে, আবার কখনো একে অপরের পরিপূরক হয়ে কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে। কবি উত্তম দাশের কাব্যে প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে চলেছে। কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তাঁকে মৌলিকতা দান করেছে। তিনি একদিকে নর-নারীর মিলনের পটভূমিকায় যেমন প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন তেমনি অপরদিকে তাঁর লেখনিতে বিরহ ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেমিকার জন্য অপেক্ষারত কবি সে কথা জানিয়ে বলেছেন—

'শিমূলশাখার মতো দুলে ওঠে যখন গোধূলি
প্রতিশ্রুতি তুমি আসবে বনভূমি নিসৃত মর্মরে
শোনাবে বৈকালীগান, চেয়ে থাকি স্মিত কৌতূহলি
কখন ফোটাবে হাসি কৃষ্ণচূড়া তোমার অধরে।'[৩৫]

আবার বহু কবিতায় নায়ক-নায়িকার মিলনে কবি নিসর্গ প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন নিপুণ মুন্সিয়ানায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর 'একালের মঙ্গলকাব্য' কবিতাগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

'কালকেতু
একটা চকাশ করে চুমো খেল ফুল্লোরার ঠোঁটে
চুমো খেলে খুব সুড়সুড়ি লাগে ফুল্লরার
আজ তো নাকে মুখেই গোফ ঢুকে গেল, কোন ক্রমে নিজেকে
ছাড়িয়ে এত জোরে হাঁচলো, পাঁচঘণ্টর শুষনি শাক
সব মাটিতে, হা হা করে হাসলো কালকেতু
পেছনে বন থরথর করে কাঁপলো
একটা চাঁদ উঠছিল গাছগাছালির ফাঁকে
ঝুপ করে আড়ালে সরে গেল'[৩৬]

প্রকৃতির এই অভিনব ব্যবহার উত্তম প্রতিভার বিশেষ দিক। নিসর্গের এই তাৎপর্যপূর্ণ অবতারণার ভূয়সী প্রশংসা করে

প্রখ্যাত সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন—

‘প্রাকৃতিক দুটো নরনারীকে একাঙ্গ করতে গিয়ে প্রকৃতিই আড়ালে সরে গিয়ে
যেন আর একটা আড়াল করে দিয়েছে, কবি কথাশিল্পীর হাত দিয়ে।’[৩৭]

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিকে নারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।কবি উত্তম দাশ তাঁর বহু কবিতায় প্রকৃতিকে নারীর দুই রূপ জননী ও জায়া রূপে চিত্রিত করেছেন।শ্যামল জংলা বাংলা কবির কাছে শুধু মাটি নয়, মা টিও বটে।জননীরূপ গ্রাম্য প্রকৃতিকে কবি কোন দিন ভুলতে পারেন নি।সবুজ পল্লীজননী কবির হৃদয়জুড়ে আজীবন বিরাজমান।তাই অকপটে কবি বলেছেন-

‘বড় বেশি জায়গা জুড়ে ছিল প্রকৃতি
সারা দেশ জুড়ে ছিল কেমন গ্রাম গ্রাম গন্ধ
গাছগাছালির অন্ধকার
পুকুরের জলে ডুবে যাওয়া রাস্তা
ঝুম বৃষ্টির মধ্যে লাঙল-ছাড়া গরু
এই সব গ্রাম্যতার মধ্যে মা শব্দ বসানো ছিল’[৩৮]

জীবন-জীবিকার তাগিদে কবির জীবনপথের বদল ঘটল। পল্লী মা’কে ছেড়ে এসে উঠলেন ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন নগর কলকাতার দশতলা ফ্লাটে। নাড়ীর সম্পর্কে ছেদ ঘটল।শহুরে সাজানো গুছানো কৃত্রিম লতাগুল্মের মধ্যে চেনা গ্রাম্যমায়ের গন্ধ পান না। জনম দুঃখিনী মাকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। মা হারা কবি উত্তম আক্ষেপ করে জানিয়েছেন—

‘এই মাকে তুমি কোথায় রেখে এলে?
তোমার দশতলা ফ্লাটে যে সব গুল্মলতা ঝোলে
তাদের শরীরে কোথায়ও গ্রাম নেই
বনজ গন্ধ নেই, এখানে তুমি মা শব্দের কান্না
আর অভিমান কোথায় পাবে’[৩৯]

প্রকৃতি কবির প্রেয়সী। রহস্যময়ী প্রেমিকার মতো কবির জীবন-যৌবনে সে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। নদ-নদী-অরণ্য বেষ্টিত শ্যামল প্রকৃতি কবির বাল্যের ক্রীড়া সঙ্গিনী শুধু নয় যৌবনের জায়াও বটে। একাধিক কবিতায় দেখা যায় প্রকৃতি-মানুষীর জন্য কবির নিবেদিত প্রেমের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। বাস্তবে তিনি একাধিক নারীর প্রেমের স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রটা অপূর্ণ থেকে গেছে। জীবন যন্ত্রণায় ক্লান্ত কবি দুবাহু বাড়িয়ে ফিরে যেতে চান তাঁর প্রেমিকা প্রকৃতির কাছে। স্মৃতি কাতর কবি ব্যথাতুর কণ্ঠে তাই বলেছেন—

‘এখনো কি সেই মেহেদির রঙ হাতে মাখো, ঠোঁটে সেই ভেজা
আছে কি এখনো সেই জলজ উদ্ভিদ শুধুই জন্মাতো

তোমার শরীর ঘিরে, খুব রোদ ভেঙে পড়তো
বৃষ্টি এলে কোলাহল শীতের জড়ানো
জঙ্গলের রঙ ধরতো শরীর ওপারে নদীতে মেঘ
ছায়া পড়তো এপারে জঙ্গলে সেই শরীর
মনে আছে সেই শরীর উৎসবময় তুমিই দেখাতে'[৪০]

প্রকৃতির আনন্দসাগরে অবগাহন করে কবি প্রকৃতির স্পন্দনকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য-উৎসব দেখতে দেখতে কবি বলেছেন-

'সেই ছায়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়তাম
তোমার শরীর থেকে জলজ উদ্ভিদ শেকড় নামিয়ে দিত
আমি ঘুমিয়ে পড়তাম'[৪১]

কবি বিরহী ক্লান্ত পুরুষ। নিসর্গ প্রকৃতি তাঁর আশ্রয়দাত্রী নারী। সেই নিরাপদ আপনার জনের প্রেমের আশ্রয়ে ফিরে এসে নিদ্রাহীন অবসন্ন কবি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে জানিয়েছেন—

'কতদিন আমি ঘুমাই না, জানো কত দিন
কতদিন পরে তাই, এই ফিরে আসা'[৪২]

ক্লান্তপ্রাণ কবি প্রকৃতি প্রেমিকার কোলে মাথা রেখে শুধুমাত্র ঘুমানোর জন্য ফিরে এসেছেন তা নয়, অর্ধনারীশ্বর হয়ে বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছেন। কবির এই মানসবাসনা কবি জীবনানন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবুজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়ে কবি উত্তম জীবনের জয়গান গেয়েছেন 'ঠাকুর পুকুর থেকে' কাব্যে। তিনি প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে জীবন ও মৃত্যুকে এক পঙক্তিতে বসিয়েছেন একাব্যের কবিতাগুলিতে। প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যুর ত্রিবেণী-সঙ্গম কবির একাব্য। কবিপত্নী মালবিকাদেবী ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই এর দিনগুলিকে প্রকৃতির রঙে মিশিয়ে প্রকৃতি ভাবনার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন কবি । যেমন—

'বাইরে বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতি, ভরা শ্রাবণ
এই বৃষ্টিতে ভিজছে সামনের দিঘি, রাজ হাঁসগুলো
নিজের মতো চরে বেড়াচ্ছে, বৃষ্টিরধারায়
চারিদিকে উথলে উঠছে সবুজ
আমি যেন একা পরবাসী এই পরিবেশে'[৪৩]

প্রকৃতির মধ্যে থেকেও কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে মেলাতে পারছেন না। মৃত্যুভাবনা কবি ও প্রকৃতির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান কবি তাই বলেছেন—

'আচ্ছা প্রকৃতির কি মৃত্যুচেতনা আছে
তারা কি বুঝতে পারে জীবনের ভাষা
শিশুগাছের দল মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজছে
আর জীবন শব্দ নিয়ে উদ্দাম লোফালুফি করছে'[৪৪]

কবির বিশ্বাস একমাত্র প্রকৃতিই পারে আমাদের শোক-তাপ-জ্বালা ভুলিয়ে পরম শান্তির খোঁজ দিতে। তাই তিনি ফিরে গেছেন প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতির মাঝে। কঠিন সময়ে প্রকৃতির পাশে বসে প্রকৃতির কাছ থেকে বেঁচে থাকার নতুন জীবনীশক্তি সংগ্রহ করেছেন। মৃত্যুর হাতছানিকে উপেক্ষা করে প্রকৃতির হাত ধরে জীবনের সন্ধান করেছেন এই কাব্যের একের পর এক কবিতায়। যেমন—

'জীবন এক প্রবাহ
এসো সবাই মিলে ভোগ করি তাকে'[৪৫]

মানুষ আজ পরশুরামের মতো কুঠার হাতে প্রকৃতিকে নির্দয়ভাবে প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলেছে। সর্বত্র চলছে প্রকৃতি নিধন যজ্ঞ। দ্রুত নগরায়ণের ফলে ক্রমশ ছোট থেকে ছোটতর হয়ে আসছে আমাদের প্রকৃতি। বুকভরে ও প্রাণখুলে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উন্মুক্ত সবুজ প্রকৃতির আজ বড়ো অভাব। ক্রমবর্ধমান সবুজহীন, প্রাণহীন, শ্রীহীন নিষ্প্রভ প্রকৃতিকে দেখে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি অতীত-চারণায় আক্ষেপ করে বলেছেন—

'এই গ্রাম আর নেই
সেই সব গাছপালা গন্ধের মতো হারিয়ে গেছে
ডোবা পুকুরের শাওলা আর তেচোখা মাছের ঘূর্ণি
সব হারিয়ে গেছে জীবন থেকে
তাহলে এখন কি নিয়ে বাঁচব'[৪৬]

কবি আশৈশব শ্যামল প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। প্রকৃতি তাঁর প্রাণের দোসর। কিন্তু আজ প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের ইট-কাঠ-পাথরের মাঝে থেকে থেকে তিনি ক্রমে আত্মিকমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। নগর কলকাতার বাতাসে আর সেই স্বচ্ছতা নেই। ধোঁয়া আর ধুলোয় নীল আকাশ মুখ ঢেকেছে। তাই আশাহত কবি দুঃখের সুরে জানিয়েছেন—

'এ নগরে নিসর্গকে কোথাও দেখিনি
পাথরে প্রোথিত বৃক্ষ অকস্মাৎ
যাদুঘরে সুরক্ষিত আশ্চর্য ম্যমির
স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়, হঠাৎ ফাল্গুনে
কৃষ্ণচূড়া শাখাগুলি রক্তাক্ত শরীরে

রাজকীয় সাক্ষী হয় গোপন হত্যার।'[৪৭]

আবার এক সময় পাতালরেলের কারণে শহর কলকাতার বুকে প্রচুর গাছ কাটা হয়েছিল।উত্তমের প্রকৃতি সচেতন সংবেদনশীল কবিমন নির্বিচারে এই বৃক্ষনিধন ও ছেদনকে সমর্থন করতে পারে নি।কবিতার মধ্যদিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেছেন এইভাবে—

'সংবদ্ধ নয় বলে কলকাতার অনাথ গাছগুলোকে
এই ভাবে হত্যা করবেন
আমাদের পাতালে নামাতে গিয়ে
পাতাল থেকে শেকড় উপড়ে
গ্রীষ্মের খরায় আগুন লাগানো ভালোবাসার
কৃষ্ণচূড়া অথবা আকাশ কালো বৃষ্টির
ভীজে তপস্যার অশ্বত্থের সমাধি
নির্বিচারে হত্যায় পাঠাবেন কাঠের গুদামে'৪৮

তাই প্রকৃতিসচেতন কবি উত্তম দাশের অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনা—

'পৃথিবীতে ঘাস ওঠার মতো
কিছু জায়গা থাক
আর বইবার মতো কিছু বাতাস' [৪৯]

কবি উত্তম দাশের প্রকৃতি ভাবনায় বৈচিত্র্য ও বিবর্তন লক্ষণীয়।কবি যে সব সময় কেবলমাত্র সুন্দরের চোখে প্রকৃতিকে দেখেছেন, তা কিন্ত নয়।বহু কবিতায় তির্যকভাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন।তার এই দেখার মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি কোনটাই নেই।বাস্তববাদী কবি তাই অকপটে জানিয়েছেন—

'তুমি সে দিন শরৎ বিষয়ে যে কবিতা পড়লে, খুবই চমৎকার,
অবশ্যই তুমি নিরপেক্ষ সর্বজনীন মানুষ বলে গ্রামের
পথঘাটের কথা কিছু লেখনি, মাঠের ধান গাছের ডগা ডুবে গিয়ে
যখন রাস্তার কালো বেড়াটা ছুঁয়ে ফেলেছে জল
ঠিক তখনই শরৎ আসে বঙ্গদেশে'[৫০]

এই বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যিক রসিকতা কবিতাটিকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করেছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবির এই তির্যকতার মূল লক্ষ্য কিন্ত প্রকৃতি নয়।সঠিক অর্থে প্রকৃতিকে না জেনে, না বুঝে যারা শুধুমাত্র কবিতার জন্য কবিতায় প্রকৃতিচর্চা করেন তাদের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন একটা বার্তা আছে একবিতায়।কবির এই তির্যকতা আরো ধারালো, শাণিত ও ইঙ্গিতবহ হয়েছে

'ভ্রমণের দাগ' কাব্যের 'রাত একটার বৃষ্টি' কবিতায়।,

'এখন রাত একটা, বাইরে গোয়েন্দা গল্পের মতো
বৃষ্টি হচ্ছে, নিশ্চয় খুব পিছল পথঘাট, রাধে
অভিসারে বেরিও না, তোমার শ্রীমান ভিজুক।'[৫১]

'ভারতবর্ষের একজন' কাব্যের 'সুন্দরের অসুখ করে না' কবিতায় কবি উত্তমের প্রকৃতিচেতনা এক অন্যমাত্রা পেয়েছে।তিনি সুন্দরের পূজারী।সুন্দরের অন্বেষণে তাঁর আজীবন পথচলা।হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে তাঁর মন ঘোরে প্রকৃতির রূপান্বেষণে।এই ব্যস্ততা কবিকে গতিশীল করেছে।তিনি সুন্দরের সাধক।প্রকৃতির পথে পথে সুন্দরের দর্পণে সত্যের সন্ধান করেছেন কাব্যে।।তাঁর চোখে নদী-পাহাড়-সমুদ্র প্রত্যেকটি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার।রূপদ্রষ্টা কবি তাই বলেছেন—

'এই যে গাছপালা চড়ে
নদীতে নেমে দেখে আসে জলরঙ
সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে মাপে মিনারেল
সুন্দরের অসুখ করে না
পাহাড় চড়ছে কতবার
কতবার মেঘে মেঘে পতাকা ওড়ালো
সমুদ্রের গুহা থেকে কতবার তুলেছে সূর্যকে
রোদে পুড়ে বৃষ্টি এলে কতবার ধুয়েছে শরীর
মৃত্যুকে ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে জীবন
সুন্দরের অসুখ করে না'[৫২]

কবিতা শেষে কবি পাঠককে নিয়ে যান এক দার্শনিক চেতনার অসীম জগতে।এক অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুকে একাসনে বসিয়ে দিলেন কবি।মানুষ মহাপ্রকৃতি থেকে পৃথিবীতে আসে; আর মৃত্যুর পর আবার সেই মহাপ্রকৃতিতে মিশে যায়।এই চরম সত্যকে নিসর্গের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করলেন কবি।তাই একবিতায় কবির প্রকৃতিচেতনা কেবলমাত্র নিছক সৌন্দর্য দর্শনে আর আবদ্ধ থাকে না।বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে অভ্যন্তরস্থ যে শক্তি আছে তার সন্ধান দেয়।আর এখানেই বোধ হয় উত্তম ঘাটের অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র পথের পথিক।

প্রসঙ্গত আর কথা উল্লেখ করা যায়, কবি উত্তম দাশের প্রকৃতিভাবনা ও নিসর্গচেতনা অনেকাংশে অগ্রজ দুই প্রকৃতি-তাপস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী।কবিগুরু যেখানে প্রকৃতির মধ্যে শাশ্বতকালের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন; বিভূতিভূষণ সেখানে প্রকৃতিকে এক আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত করেছেন।দুজনেই প্রকৃতি-সাধক, কিন্তু সাধনার পথ ও মত ভিন্ন , এই যা।আর উত্তমের প্রকৃতিভুবন দুই অগ্রজের

প্রকৃতিচেতনার সঙ্গমস্থল। আবার কখনো কখনো তাঁর প্রকৃতিচিন্তনে কবি জীবনানন্দের 'রূপসী বংলা'র সুর ও স্বর ধ্বনিত হয়েছে। তবে জীবনানন্দের প্রকৃতি কোথাও কোথাও জীবনের নেতিবাচক বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু উত্তম সব সময় প্রকৃতিকে দেখেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রকৃতি আশা-অনুপ্রেরণার বার্তাবহ হয়ে এসেছে তাঁর কবিতায়।প্রকৃতির মতো সহজ-সরল তাঁর কবিতা। কোন কষ্টকল্পিত কবিত্ব প্রকাশের ব্যর্থ-প্রচেষ্টা কোথায় নেই। এক অকৃত্রিম সজীবতা ও প্রাণধর্মিতার মেদুর স্পর্শ লেগে আছে তাঁর প্রকৃতি-আশ্রিত কবিতাগুলিতে। মহাপ্রকৃতির বিপুলতার মধ্যে তিনি সন্ধান করেছেন এক অনন্ত রহস্যের। আর এই সন্ধান তাঁর প্রকৃতি-বোধের অন্যতম উৎস সন্ধান, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

তথ্যনির্দেশ:

১) দাশ উত্তম। আত্মজীবনীর খণ্ডাংশ (উত্তম দাশ : মনে ও মননে)। সম্পাদনা উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও মাহমুদ কামাল। সাফল্য প্রকাশন, ১২/২/৩ জামির লেন, কলকাতা ৭০০০১৯। ১ম সং, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃঃ ১৫।

২) সেনগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ। দুঃখবাদী (শ্রেষ্ঠ কবিতা)। সম্পাদনা সুশান্ত বসু। ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩।১ম সং, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃঃ ৫৪।

৩) দাশ উত্তম।'আমার মধ্যে একজন'- 'জ্বালামুখে কবিতার', কবিতাসমগ্র ১ ।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪ ।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ৯১।

৪) দাশ উত্তম।'লৌকিক অলৌকিক'- 'লৌকিক অলৌকিক', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ৪৬।

৫) দাশ উত্তম। 'মা শব্দের কান্না'- 'প্রকীর্ণ কবিতা' ।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪ ।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৬।

৬) দাশ উত্তম।'লৌকিক অলৌকিক'- 'লৌকিক অলৌকিক', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ৪৬।

৭) দাশ উত্তম। 'মন খারাপের গল্প'- 'কাব্যনাট্য ও কবিতা', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ২৩৮।

৮) দাশ উত্তম। 'ফিরে আসা'- 'ভারতবর্ষের একজন', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ১৯৬।

৯) দাশ উত্তম। 'বৃষ্টি পড়ে'- 'লৌকিক অলৌকিক', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ৬৩।

১০)দাশ উত্তম। 'বন্যা'- 'জ্বালামুখে কবিতার', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪। পৃঃ ৮৫।

১১) দাশ উত্তম। 'বৃষ্টি'- 'ভুল ভারতবর্ষ', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪। পৃঃ ২৩০।

১২) দাশ উত্তম। 'ডুয়ার্স'- 'প্রকীর্ণ কবিতা'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৯।

১৩) দাশ উত্তম। 'কবিতার কাছে'- 'ভ্রমণের দাগ', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৩৬।

১৪) দাশ উত্তম। 'জয়ন্তী পাহাড়ে একদিন'- 'প্রকীর্ণ কবিতা'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৯০।

১৫) দাশ উত্তম। '২৬ নং কবিতা'- 'ঠাকুরপুকুর থেকে'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং,জানুয়ারি ২০১০, পৃঃ ৫৬।

১৬) দাশ উত্তম। 'জল'- 'ভ্রমণের দাগ', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৪২।

১৭) দাশ উত্তম। 'তুমি কি দীঘায় যাবে'- 'যখন গোধূলি', কবিতা সমগ্র ১ ।বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৪। পৃঃ ২২।

১৮) দাশ উত্তম। 'জল'- 'প্রকীর্ণ কবিতা' ।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪ ।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৬।

১৯) দাশ উত্তম। 'নুন'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

২০) দাশ উত্তম। 'সমুদ্র থেকে ফিরে'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১০২।

২১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ।সঞ্চয়িতা ।সিলেকশন, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা ৭০০০৭৩ ।১ম সং, ২০১১, পৃঃ ১০৯।

২২) দাশ উত্তম। 'জল'- 'ভ্রমণের দাগ'। কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৫৬।

২৩) দাশ উত্তম। 'পুরী সিরিজ'- 'অগ্রন্থিত কবিতা', শ্রেষ্ঠ কবিতা। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মার্চ ২০১২, পৃঃ ১৩৪।

২৪) দাশ উত্তম। 'রসুলপুরে'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' ,কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১০৯।

২৫) দাশ উত্তম। 'দুই বন্ধুর গল্প'- 'কাব্যনাট্য ও কবিতা' কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

২৬) দাশ উত্তম। 'এখন ভোর হলো'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' , কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৫৬।

২৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ।ছিন্নপত্র ।মহামায়া বুক এজেন্সী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৯ ।১ম সং, আষাঢ়

১৯০৯, পৃঃ ৫৬।

২৮) দাশ উত্তম। 'মিরিক ডিসেম্বর ১৯৭৯'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' , কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৮৬।

২৯) দাশ উত্তম। 'তিন জোড়া চোখে বকখালি'- 'জ্বালামুখে কবিতার', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ৮০।

৩০) দাশ উত্তম। 'কক্সবাজার'- 'জ্বালামুখে কবিতার', কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ৯০।

৩১) দাশ উত্তম। 'দাঁড়িয়ে ছিলে'- 'ভুল ভারতবর্ষ', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৮৭।

৩২) দাশ উত্তম। 'মধ্যরাত'- 'প্রকীর্ণ কবিতা'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৯।

৩৩) দাশ উত্তম। 'দার্জিলিং-ডিসেম্বর ১৯৭৯' , 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' , কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৮৩।

৩৪) দাশ উত্তম। 'অন্ধকার বাংলোঘরে' , 'ভুল ভারতবর্ষ', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৫৮।

৩৫) দাশ উত্তম। 'যখন গোধূলি'- 'যখন গোধূলি', কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

৩৬) দাশ উত্তম। '৩ নং কবিতা'- 'একালের মঙ্গলকাব্য', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

৩৭) মজুমদার উজ্জ্বলকুমার।কবি উত্তম দাশ : একটি স্বতন্ত্র পথরেখায় (উত্তম দাশ : মনে ও মননে)।সম্পাদনা উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও মাহামুদ কামাল।সাফল্য প্রকাশন, ১২/৩/৪ জামির লেন, কলকাতা ৭০০০১৯।১ম সং, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃঃ ৩৬।

৩৮) দাশ উত্তম। 'মা শব্দের কান্না'- 'প্রকীর্ণ কবিতা'।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৬।

৩৯) দাশ উত্তম। 'মা শব্দের কান্না'- 'প্রকীর্ণ কবিতা'।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৬।

৪০) দাশ উত্তম। 'ফিরে আসা'- 'ভারতবর্ষের একজন', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

৪১) দাশ উত্তম। 'ফিরে আসা'- ভারতবর্ষের একজন', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

৪২) দাশ উত্তম। 'ফিরে আসা'- ভারতবর্ষের একজন', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৯০।

৪৩) দাশ উত্তম। '৩ নং কবিতা'- 'ঠাকুরপুকুর থেকে'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০১০, পৃঃ ৭।

৪৪) দাশ উত্তম।'৪ নং কবিতা'- 'ঠাকুরপুকুর থেকে'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০১০, পৃঃ ৮।

৪৫) দাশ উত্তম।'৫ নং কবিতা'- 'ঠাকুরপুকুর থেকে'। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০১০, পৃঃ ৯।

৪৬) দাশ উত্তম। 'মা শব্দের কান্না'- 'প্রকীর্ণ কবিতা' ।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ৩৬।

৪৭) দাশ উত্তম। 'নগর : একটি স্বপ্ন'- 'যখন গোধূলি', কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১২।

৪৮) দাশ উত্তম। 'পাতাল রেলের অধিকর্তাকে'- 'এজন্মের প্রত্যাহার চাই' , কবিতা সমগ্র কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ৮৯।

৪৯) দাশ উত্তম। 'জতুগৃহ'- 'প্রকীর্ণ কবিতা' ।মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪।১ম সং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃঃ ২৭।

৫০) দাশ উত্তম। 'এখন শরৎ'- 'ভ্রমণের দাগ', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৪৭।

৫১) দাশ উত্তম। 'রাত একটার বৃষ্টি'- 'ভ্রমণের দাগ', কবিতা সমগ্র ২। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৬৪।

৫২) দাশ উত্তম। 'সুন্দরের অসুখ করে না'- 'ভারতবর্ষের একজন', ' কবিতা সমগ্র ১। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪। ১ম সং, মে ২০০৬, পৃঃ ১৮৭।